International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-V, September 2024, Page No.41-47
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.10.issue.05W.005

সাংখ্যদর্শনে পুরুষ - একটি সমীক্ষা

সুব্রত খাঁড়া
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, এ. কে. পি. সি. মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
One of the atheistic philosophical school in Indian Philosophy, Sāṁkhya school, admits two main theories – 'Puruṣa and Prakriti'. Therefore, Sāṁkhya philosophy is also called dualistic philosophy. Among them, nature is devoid of knowledge (jňāna) or consciousness(cetanā) and active(kriyāśīl) or spontaneous(svakriya). On the other hand, Puruṣa is its complete opposite in nature. Puruṣa is conscious on one side and passive on the other. This visible world phenomenon has been created as a result of Prakriti. However, the role of Puruṣa in this creation is not too little. Without Puruṣa active Prakriti is unable to create the world. Because nature is incapable of action without the presence of Puruṣa. Just as it is not possible for the crippled (paṅgu) or the blind (andha)to perform any work, but the crippled and the blind together are capable of performing any work, in the same way Prakriti can become active only when it comes near the Puruṣa. In this paper, by revealing the nature of Puruṣa, I shall try to discuss or highlight despite being inactive (niṣkriya) how can Purusa participate in the creation of the world?
Keywords: Puruṣa, Prakriti, Bahupuruṣa, Triguṇātmaka, Niṣkriya, Cetanā.

ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সর্ব প্রাচীন দর্শন সম্প্রদায়রূপে খ্যাত সাংখ্যদর্শন। সুপ্রাচীন এই দর্শনের মূল প্রবক্তা হলেন মহর্ষি কপিল। বলা হয় 'সাংখ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তি হয়েছে 'সংখ্যা' শব্দ থেকে। যেহেতু এই দর্শনে সংখ্যার বা গণনার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে তাই এই দর্শন সাংখ্য দর্শন নামে পরিগণিত হয়েছে। তাই সাংখ্য শব্দের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয় –'সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বানি যেন তৎ সাংখ্যম্'। অর্থাৎ যে শাস্ত্রে বা দর্শনে প্রকৃতি থেকে পুরুষ পর্যন্ত তত্ত্বগুলি গননা করা হয়, সেই শাস্ত্রকে 'সাংখ্য' বলা হয়। এই দর্শন ষড় আস্তিক দর্শন মধ্যে অন্যতম। আস্তিক দর্শন অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করলেও আধিবৈদ্যক দিক থেকে এই দর্শন মূলতঃ দ্বৈতবাদী এবং নিরীশ্বরবাদী দর্শন। তবে অন্যান্য দর্শন সম্প্রদায়ের মতই এই দর্শনেরও স্বীকার করা হয় জীবন দুঃখময়। তাই এই দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভ করা এবং দুঃখ থেকে নিবৃত্তির মাধ্যমে মোক্ষপ্রাপ্তি হওয়া বা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা। আর এই তত্ত্বজ্ঞানই হল আত্মজ্ঞান।

নিরীশ্বরবাদী সাংখ্য দর্শনে মূল তত্ত্ব দুটি 'পুরুষ ও প্রকৃতি'। তাই সাংখ্য দর্শনকে দ্বৈতবাদী দর্শনও বলা হয়। তন্মধ্যে প্রকৃতি হল জ্ঞান বা চেতনা রহিত ও ক্রিয়াশীল বা স্বক্রিয়। অপরদিকে পুরুষ হল তার সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব। পুরুষ একদিকে যেমন চেতন অপরদিকে আবার নিষ্ক্রিয়। প্রকৃতি থেকেই পরিণামের দ্বারা এই দৃশ্যমান জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এই সৃষ্টি কার্যে পুরুষের ভূমিকাও কম নয়। পুরুষ ছাড়া ক্রিয়াশীল প্রকৃতি জগৎসৃষ্টি করতে অসমর্থ। কেননা প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্য ব্যতীত ক্রিয়া করতে অসমর্থ। যেমন করে পঙ্গুর পক্ষে কিংবা অন্ধের পক্ষে কোন কার্য সম্পাদন করা সম্ভব না হলেও পঙ্গু ও অন্ধ মিলিত ভাবে কোনও কার্য সম্পাদন করতে সমর্থ হয়, তেমন ভাবেই প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যে এলে তবেই সক্রিয় হতে পারে। এই পত্রে মূলতঃ পুরুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন পূর্বক পুরুষ নিষ্ক্রিয় হওয়া সত্ত্বেও কীরূপে জগৎসৃষ্টি কার্যে অংশ নিতে পারে সেই দিকটিই আলোকপাত করা হবে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সাংখ্য দর্শন মৌলিক ভাবে দুটি তত্ত্বকে স্বীকার করে - পুরুষ এবং প্রকৃতি। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ আত্মতত্ত্বের বাচক শব্দ। পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ, কূটস্থ, নিরবয়ব, অসংগ[১], অপরিণামী, নিত্য শুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, নিরঞ্জন[২] তথা অনেক। পুরুষ, অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে ভিন্ন (অত্রিগুণাত্মক), বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন তথা অপরিনামী।[৩] পুরুষ নিত্যশুদ্ধস্বভাব, নিত্যবুদ্ধস্বভাব এবং নিত্যমুক্তস্বভাব। 'শুদ্ধ' শব্দের অর্থ হল - পুরুষের কোন প্রকার বিকার হয় না। প্রকৃতি অশুদ্ধ কারণ,সে পরিণামী। পুরুষ সর্বদা 'নিষ্ক্রিয় এবং কুটস্থ, তাই তার কোন প্রকার বিকার উৎপন্ন হয় না। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যা কিছু প্রতীতি হয়, তা বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত ছায়া পুরুষের হয়; তা অবাস্তবিক। বাস্তবিকপক্ষে পুরুষ সর্বদা সমান থাকে, তাই পুরুষ নিত্যশুদ্ধস্বরূপ। 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ হল চেতনা, যা জ্ঞানস্বরূপ। চেতনতা পুরুষের গুন নয়, তা হল স্বভাব। কেননা পুরুষ সর্বদা চেতন রূপে অবস্থান করে। পুরুষ হল জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা। জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি হল বুদ্ধির ধর্ম। কিন্তু বুদ্ধিতে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি বিনা পুরুষের আয়ত্তে আসে না। তাই অপরের দুঃখকে পুরুষ নিজের বুদ্ধি বলে বোধ করে এবং নিজেকে বন্ধিনে আবদ্ধ করে। এই দুঃখ থেকে নিজেকে পৃথক বোধ বা দুঃখের নিবৃত্তিই হলে সাংখ্য মতে জীব কৈবল্য বা মুক্ত হয়। তাই 'মুক্ত' বলতে বোঝায় 'দুঃখ' থেকে মুক্তি। দুঃখের মূল কারণ হল তিন প্রকার গুন (সত্ত্ব, রজ ও তমঃ), যা প্রকৃতির স্বরূপ, পুরুষ এই তিন গুন রহিত। উদাসীন ও কূটস্থ হওয়ার জন্য, সে এই গুণত্রয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। তাই সে অবিকারী। বন্ধন আর মুক্তি প্রকৃতির হয়, পুরুষের কখনও বন্ধন বা মুক্তি হয় না। সে কার্যকারণ শৃঙ্খলার মধ্যে অবস্থিত, তাই সর্বদা বন্ধনরহিত হওয়ার জন্য মুক্ত স্বভাব সম্পন্ন। এখন দেখার বিষয় জগতের কারণ বা আদি কারণ প্রকৃতি অতিরিক্ত পুরুষ স্বীকৃতির হেতু কী

সাংখ্যাচার্যগণ শরীরাদি থেকে আত্মার ভেদসাক্ষাৎকারকেই পরম পুরুষার্থ মোক্ষের সাধন বলেছেন। দুঃখনিবৃত্তির উপায়রূপে তাঁরা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ-এর বিবেককে প্রদর্শন করেছেন। এদের মধ্যে জ্ঞ হল চেতন আত্মা এবং সেটাই সাংখ্যমতে পুরুষ। পুরুষের অস্তিত্বের প্রমাণ আমরা পাই ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্য কারিকায়। সাংখ্য কারিকার পুরুষের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন –

> ''সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
> পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ''।।[৪]

পূর্বোক্ত এই কারিকা থেকে পুরুষের অস্তিত্ব বিষয়ে মূলতঃ পাঁচটি যুক্তি দেখানো হয়েছে । সেগুলি যথাক্রমে-

(১) সংঘাত পরার্থত্বাৎ
(২) ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ
(৩) অধিষ্ঠানাৎ
(৪) ভোক্তৃভাবাৎ
(৫) কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেঃ।

এখন এই পঞ্চবিধ হেতু সম্পর্কে কিঞ্চিৎ জ্ঞান আবশ্যক। যেমন প্রথমেই বলা হয়েছে সংঘাতপরার্থত্বাৎ হেতুর কথা।

সাংখ্যমতে কোন একটি কারণের দ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। জড় পদার্থমাত্রই একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে কার্য নিষ্পাদন করে। যে যে পদার্থ মিলিতভাবে কার্য করে তাকে 'সংঘাত' বলে। এজন্য জড়পদার্থমাত্রতে 'সংঘাত' বলা হয়েছে। আর 'যো যঃ সংঘাতঃ স পরার্থঃ'- যে সকল বস্তু সংঘাত, তারা পরের প্রয়োজন সাধন করে। এখানে 'পর' বলতে জড় বা সংঘাত থেকে ভিন্নকে বোঝায়। এই সকল সংঘাত যার প্রয়োজন সিদ্ধি করে, সেটি সংঘাত ব্যতিরিক্ত পদার্থ, সেটিই পুরুষ। এখানে বক্তব্য এই, শয্যা আসন প্রভৃতি সংঘাত পদার্থ মিলিত হয়ে সর্বদা পরেরই প্রয়োজন সিদ্ধি করে, এদের পরার্থত্ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতি একাত্মিকা। প্রকৃতি অন্যের সাথে মিলিত হয়ে কার্য করে না।তাই প্রকৃতিকে তো সংঘাত বলাই যায় না। সুতরাং এখানে প্রকৃতিমহদাদি সকল জড় পদার্থরূপ পক্ষের একদেশ প্রকৃতিতে সংঘাতত্ত্ব না থাকায় ভাগাসিদ্ধি দোষ হবে। এই আশঙ্কার সমাধানে বাচস্পতিমিশ্র বলেছেন - 'সুখদুঃখমোহাত্মকতয়া অব্যক্তাদয়ঃ সর্বে সংঘাতাঃ।' অর্থাৎ প্রকৃতি থেকে আরম্ভ করে সকল পদার্থই সুখদুঃখমোহাত্মক হওয়ায় তাদের সকলকেই 'সংঘাত' বলা হয়। অতএব যার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য প্রকৃতি প্রভৃতি জড় পদার্থ মিলিতভাবে কাজ করে, সেটাই হবে প্রকৃত্যাদিসংঘাত ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব এবং সেটাই পুরুষ। এইভাবে সংঘাতত্ত্ব হেতুদ্বারা অব্যক্ত ও ব্যক্ত পদার্থ হতে অতিরিক্ত পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ-এই হেতু আলোচনার প্রথমেই প্রণিধানযোগ্য যে— শয্যা, আসন প্রভৃতি সংঘাত যে অন্যের প্রয়োজন সাধক হবে, এতে কোন দ্বিমত নেই। তবে এখানে যদি 'অন্য' বলতে শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে বোঝায় তা হলে সংঘাতত্ত্ব হেতুর দ্বারা পুরুষের অস্তিত্ব সিদ্ধ হবে না। আশভাকারীর এরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্পে বক্তব্য এই, এখানে সংঘাত যদি সংঘাতান্তরের প্রয়োজন সাধক হয় তবে ঐ সংঘাতান্তর আবার অন্য সংঘাতের প্রয়োজনসাধক হবে, এভাবে চলতে থাকলে অনবস্থা দোষ দুর্নিবার হবে। কিন্তু সংঘাতত্ত্ব হেতু দ্বারা পরার্থত্ব সাধন হলে 'পর' শব্দের দ্বারা সংঘাত ব্যতিরিক্ত অসংহতকে বোঝালে এই অনবস্থা দোষ থাকে না। পুরুষ অসংহত বলে তাকে সংঘাত ব্যক্ত ও অব্যক্তের বিপরীতধর্মী বলতে হবে। অর্থাৎ পুরুষকে অত্রিগুণ, বিবেকী, অবিষয়, অসামান্য, চেতন ও অপ্রসবধর্মী বলতে হবে, কারণ এগুলোর ঠিক বিপরীতধর্ম (ত্রিগুণত্বাদি) ব্যক্ত ও অব্যক্তের সাধর্ম। প্রসঙ্গতঃ বলা আবশ্যক 'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ' -রূপ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা সাংখ্য সম্মত পুরুষ সেই দর্শনেই স্বীকৃত প্রকৃতির যে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাব তা ব্যক্ত হয়েছে। সাংখ্য মতে প্রকৃতি হল ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা। এখানে ত্রিগুণ বলতে সত্ত্ব, রজ ও তমঃ গুণের কথা বলা হয়েছে। তন্মধ্যে সত্ত্বগুণের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে সত্ত্বগুণ হল প্রকাশক অর্থাৎ প্রকাশ স্বভাব। অন্যদিকে রজোগুণ উপষ্টম্ভক (প্রবর্ত্তক) এবং তমোগুণ নিয়ামক হয়। একইসঙ্গে ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় বলেছেন, সত্ত্বগুণের ধর্ম হল 'লঘুতা', রজোগুণের ধর্ম অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য এবং তমোগুণের ধর্ম গুরুতা।

উক্ত ত্রিগুণআত্মক প্রকৃতির বিপরীতস্বভাব হল পুরুষ একথা ব্যক্ত করতেই ঈশ্বরকৃষ্ণ পুরুষের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন—'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ। এখানে 'যত্র যত্র সংহতত্ত্বং তত্র তত্র ত্রিগুণত্বাদি'— এরূপ ব্যপ্তির দ্বারা এটাই সিদ্ধ হয় যে, সংহতত্ত্ব ত্রিগুণত্ত্বাদি দ্বারা ব্যক্ত। অর্থাৎ ত্রিগুণত্ত্বাদি সংহতত্ত্বের ব্যাপক। আর ব্যাপকাভাবের দ্বারা ব্যাপ্যাভাব অনুমিত হয় (ব্যাপকাভাবে ব্যাপ্যাডারঃ) এরূপ নিয়মবশত পুরুষে ত্রিগুণত্বাদি ব্যাপক ধর্মের অভাব থাকায় সংহতত্ত্বরূপ ব্যাপ্য ধর্মেরও অভাব থাকবে। অতএব আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণের 'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ' এরূপ উক্তির দ্বারা এটাই সূচিত হয় যে, প্রকৃতি প্রভৃতি অব্যক্ত ও ব্যক্ত পদার্থ যে পরের প্রয়োজনসাধক হয়, সেটি সংঘাত ব্যতিরিক্ত অসংহত আত্মাই হবে। এটিই সাংখ্যমতে পুরুষ। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ যুক্তির অতিরিক্ত তৃতীয় যুক্তিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে অধিষ্ঠানাৎ-এই যুক্তির কথা।

পুরুষ যে আছে তাতে অন্যতম একটি হেতু হল অধিষ্ঠানাৎ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় জড় এবং জড় কখনো স্বয়ং ক্রিয়াশীল হতে পারে না। তাই জগৎ সৃষ্টাদি কার্যে জড়ের অধিষ্ঠানরূপে আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করতে হবে। আত্মা বা পুরুষ অধিষ্ঠান হওয়াতেই জড়সমূহের বিচিত্র ও অনন্ত পরিণাম হয়ে থাকে। তবে প্রকৃতি প্রভৃতির তাদৃশ পরিণামের কর্তা পুরুষ নয়। পুরুষের সান্নিধ্যই প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণামের হেতু। যেমন চালক সারথির সান্নিধ্যবশত রথ চলে, তেমনই পুরুষের সান্নিধ্যবশত প্রকৃতি প্রভৃতির পরিণাম হয়। সুখদুঃখমোহাত্মক শরীরাদি যত পদার্থ আছে, সকলেই পুরুষের দ্বারা (চেতন আত্মার দ্বারা) অধিষ্ঠিত হয়ে স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত হয়। এইভাবে পুরুষ ইন্দ্রিয়গোচর না হলেও শরীরাদি অচেতনের কার্যের ছারাই তার অধিষ্ঠাতা দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মা 'পুরুষবিশেষ' অনুমিত হয়।

পুরুষ যে অস্তিত্বশীল তার স্বপক্ষে ঈশ্বরঋষ্ণের প্রদত্ত অন্যতম এক হেতু হল ভোক্তৃভাবাৎ । ঈশ্বরকৃষ্ণের মতে উক্ত হেতুর দ্বারাও পুরুষের অস্তিত্বকে অনুমান করা যায়। 'ভোক্তৃভাবাৎ' পদের অর্থ ভোক্তৃত্বাৎ। বাচস্পতিমিশ্র দেখিয়েছেন যে, এখানে 'ভোক্তৃভাব' শব্দের দ্বারা ভোগ্য সুখদুঃখাদি উপলক্ষিত হয়েছে। সুখদুঃখাদি যদি ভোগ্য হয় তা হলে তার অতিরিক্ত এক ভোক্তা স্বীকার করতে হবে। ভোক্তা ছাড়া ভোগ্যের ভোগ্যত্ব সম্ভব নয়। ভোগ্য কখনো ভোক্তা হতে পারে না। সুতরাং যিনি ভোক্তা হবেন, তিনি সুখদুঃখমোহাত্মক ভোগ্যবস্তু থেকে অতিরিক্ত হবেন। ঐ ভোক্তাই সাংখ্যমতে পুরুষ। অথবা 'ভোক্তৃভাব' শব্দে দ্রষ্টৃভাবকে বুঝতে হবে। দৃশ্য বুদ্ধ্যাদি ভোগ্য। দৃশ্য সুখদুঃখমোহাত্মক বুদ্ধ্যাদি থেকে তার অতিরিক্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সেই দ্রষ্টাই আত্মা, সেটাই সাংখ্যমতে পুরুষপদবাচ্য।

পুরুষের অস্তিত্বে অন্তিম হেতুরূপে উল্লেখ করা হয়েছে কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তির কথা। কৈবল্যের জন্য শাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয়, তার দ্বারাও পুরুষের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। সাধারণতঃ 'কৈবল্য' শব্দের অর্থ আত্যন্তিক দুঃখোপশম। যদি পুরুষ নামক তত্ত্বটি স্বীকৃত না হয় তা হলে কৈবল্যের জন্য প্রবৃত্তি ব্যাহত হয়। এই কৈবল্য বুদ্ধ্যাদির সম্ভব নয়। বুদ্ধ্যাদি পদার্থ দুঃখাদ্যাত্মক। দুঃখ যদি বুদ্ধ্যাদির স্বরূপ বা স্বভাব হয়, তা হলে বুদ্ধ্যাদি থেকে দুঃখের আত্যন্তিক উপশম কখনোই সম্ভবপর হয় না। দুঃখাত্মক পদার্থকে দুঃখবিযুক্ত করা যায় না। বুদ্ধাদিকে দুঃখবিযুক্ত স্বীকার করলে তাদের স্বরূপেরই নাশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু কারো কখনো স্বরূপের নাশ হয় না। এজন্য বুদ্ধ্যাদি থেকে অতিরিক্ত অদুঃখাত্মক পুরুষ অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। তাকে দুঃখবিমুক্ত করা সম্ভব হতে পারে। কেননা পুরুষে অন্তঃকরণ ধর্ম দুঃখাদি আরোপিত হয়। আর বিবেকজ্ঞানের দ্বারা সেই আরোপিত দুঃখের নাশ হলে পুরুষের স্ব স্বরূপে অবস্থান রূপ কৈবল্য সম্পন্ন হয়। অতএব আগম বা শাস্ত্রের কৈবল্যার্থ প্রবৃত্তির জন্য বুদ্ধ্যাদি থেকে অতিরিক্ত আত্মাকে স্বীকার করতে হবে। এই

আত্মাই পুরুষ। পুরুষ স্বীকার না করলে শাস্ত্রের ও মহর্ষিগণের এতাদৃশ প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হয়। তাই পুরুষের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। পুরুষের অস্তিত্ব সাধক এ সকল প্রমাণ আলোচনার দ্বারা পুরুষের স্বরূপ ও প্রয়োজনও জ্ঞাপিত হল।

সাংখ্য দর্শনে স্বীকৃত এই পুরুষ কিন্তু বহু। যদিও প্রতি শরীরে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন অথবা সর্বশরীরে এক আত্মা বিরাজমান, এ বিষয়ে কিন্তু দার্শনিকদের মধ্যে কোন অভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায় না, প্রবল মতবিরোধ লক্ষ্যনীয়। যেমন শঙ্কর প্রমুখ অদ্বৈত বৈদান্তিকগণের দৃষ্টিতে আত্মা এক। কিন্তু গৌতম কণাদ প্রভৃতি ন্যায়বৈশেষিকগণের দৃষ্টিতে আত্মা বহু। সাংখ্য দর্শনে কিন্তু পুরুষ বা আত্মা বহু। এখন দেখার বিষয় সাংখ্যতত্ত্ববিৎ ঈশ্বরকৃষ্ণ কীভাবে পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদন করেছেন
ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্য কারিকায় পুষষের বহুত্ব প্রতিপাদনে বলেছেন –

> ‘‘জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
> পুরুষবহুত্ত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিচর্যয়াচ্চৈব’’।।[৫]

অর্থাৎ জন্মমরণকরণের প্রতিনিয়ম, অযুগপৎ প্রবৃত্তি এবং ত্রিগুণের বিপর্যয় থেকে পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়।

পূর্বোক্ত যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে পুরুষের বহুত্ব সাধক প্রথম যুক্তিটি হল জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাৎ। অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যুর বিশেষ নিয়ম হেতু পুরুষের বহুত্ব সিদ্ধ হয়। প্রকৃতিসম্ভূত লিঙ্গশরীরের অদৃষ্টাখ্য সংস্কারবশত বাহ্য শরীরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ হয়, তাকেই জন্ম বলে। আর মৃত্যু হল ফলভোগবশত আরব্ধ কর্মক্ষয়ে লিঙ্গশরীরের স্থূলশরীর ত্যাগ। এই জন্ম ও মরণ বিষয়ে প্রত্যেক পুরুষে বিশেষ নিয়ম দেখা যায়। জন্মান্তরীণ কর্মানুসারে কেউ কখনো জন্মায়, আবার কেউ কখনো মৃত্যু বরণ করে। জীবের সকল শরীরে যদি একই আত্মা থাকে, তবে একজনের জন্মে সকলেরই জন্ম হত, আবার একজনের মরণে সকলেরই মৃত্যু হত। কিন্তু তা হয় না। আর সকল শরীরের একটি আত্মা থাকলে একজন অন্ধ হলে সকলেই অন্ধ হত। অথবা একজন দেখলে সকলেই দেখতে পেত। এইভাবে একপুরুষত্বপক্ষে এরকম নানা অব্যবস্থা আসন্ন হত। সুতরাং এই অব্যবস্থা নিরসন করতে প্রতিশরীরে পুরুষভেদকেই স্বীকার করতে হবে। এ বিষয়ে সাংখ্যসূত্রকার বলেছেন— ‘জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্।’[৬] অদ্বৈতবৈদান্তিকগণ যদি এখানে আক্ষেপ করেন, আকাশ এক হলেও উপাধিবশত যেমন ঘটাকাশ, পটাকাশ ইত্যাদি ব্যবহারে নানা বলে প্রতীত হয়, তেমনই পুরুষ (আত্মা) এক হলেও নানা শরীরাদি উপাধিভেদে বহু বলে প্রতিভাত হয়। এর ফলে একের জন্মাদিতে সকলের জন্মাদি হয় না। কিন্তু অদ্বৈতীদের এরূপ যুক্তিও সমীচীন নয়। কেবল উপাধির দ্বারা কখনো বস্তুর ভেদ সিদ্ধ হয় না। অন্যথা একজনের হস্তপাদস্তনাদি উপাধিভেদের দ্বারা ঐ ব্যক্তির বহুত্ব সিদ্ধ হত। আর কোন উপাধির উৎপত্তিতে ও নাশে উপহিত ব্যক্তির উৎপত্তি ও নাশ হত। কিন্তু তা হয় না। কোন ব্যক্তির স্তনাদির উৎপত্তিতে সেই ব্যক্তির জন্ম হয় না। অতএব জন্মমরণ ব্যবস্থাবশত আত্মার বহুত্বই সম্পন্ন হবে।

পুরুষ বহু তার কারণরূপে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন অযুগপৎ প্রবৃত্তি অর্থাৎ সকল প্রাণীর একই সাথে প্রবৃত্তি হয় না। একই সময়ে একজনের গমনাদি ক্রিয়ায় প্রবৃত্তি দেখা যায়, আবার অন্য জনের তাতে নিবৃত্তি দেখা যায়। প্রযত্নলক্ষণ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি যদিও অন্তঃকরণনিষ্ঠ, পুরুষে সেটি আরোপিত হয়। পুরুষ যদি এক হয়,

তবে একটি শরীরের চালনের দ্বারা সমস্ত শরীর যুগপৎ চলিত হোত। কিন্তু পুরুষের বহুত্বপক্ষে এরূপ কোন দোষের উদ্ভব হয় না।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রতিকর্মব্যবস্থাও পুরুষের বহুত্বসাধক হবে। অন্যথা একজন কর্ম করলেই সকলের কর্ম করা হত। তা যখন কখনোই সম্ভবপর নয়, তখন পুরুষের বহুত্বকেই স্বীকার করতে হবে। সাংখ্যকারিকার মতে, ত্রৈগুণের বিপর্যয় বশতঃ পুরুষের বহুত্ব প্রতিপাদিত হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ এই তিন গুণের সমবেত রূপ কে ত্রৈগুন্য বলা হয় এবং এদের সমানুপাতে থাকাকেই বিপর্যয় বলা হয়। সংসারের সকল জীবের মধ্যেই গুন বৈষম্য পাওয়া যায়।কারও মধ্যে সত্ত্ব, কারও মধ্যে রজ আবার কারও মধ্যে তমঃ গুণের প্রধান্যতা লক্ষ্য করা যায়। আর এই বৈষম্যতাই পুরুষের বহুত সিদ্ধ করে।

এই সকল যুক্তির ভিত্তিতে সাংখ্যাচার্যগণ পুরুষের বহুত্বকেই প্রমাণিত করেছেন। সাংখ্যসমাদৃত পুরুষবহুত্ববাদ শ্রুতিবিরুদ্ধ নয়। 'অজামেকাম্' ইত্যাদি শ্রুতিতে পুরুষের বহুত্বই উপদিষ্ট হয়েছে। আবার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' এই উপনিষদবাক্যে পুরুষের একত্ব বিবক্ষিত হয়নি।

পুরুষ বহু হলেও তা কিন্তু নিষ্ক্রিয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, নিষ্ক্রিয় পুরুষ কীরূপে জগৎ সৃষ্টিরূপ কার্যে অংশ নিতে পারে? কেননা যা নিষ্ক্রিয় তার দ্বারা কোন প্রকারের কর্ম সম্পাদন সম্ভব নয়। সেই বিষয়ে পরিষ্কার সমাধান পাওয়া যায় সাংখ্য কারিকার একবিংশতিতম কারিকায়। উক্ত কারিকার মর্মার্থ এই যে, অন্ধ ও পঙ্গুর সংসহযোগে গমন ক্রিয়ার ন্যায় পুরুষ প্রকৃতির প্রকৃতির সান্নিধ্যে ক্রিয়া করে। সাংখ্য মতে, প্রকৃতি সমস্ত জগতের জননী রূপে গণ্য হয়। কেননা সৃষ্টির আদি কারণই হল প্রকৃতি। এর মধ্যেই সমস্ত কার্য-জগৎ অব্যক্ত রূপে বিদ্যমান থাকে। ত্রিগুণাত্মক এই প্রকৃতি অবিবেকী এবং প্রসবধর্মী। ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব, রজ এবং তমঃ গুণের সাম্যাবস্থাকেই বলা হয়েছে প্রকৃতি। এই তিন গুণ অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে অর্থাৎ স্বত্ত্ব গুণ স্বত্ত্ব গুণে, রজ গুণ রজ গুণে এবং তমঃ গুণ ক্রমশ তমঃ গুণে পরিণত হয়ে চলেছে, যা স্বরূপ পরিণাম নামে পরিচিত। জীবের অদৃষ্টবশতঃ তিনটি গুণের মধ্যে কোন একটি উদ্ভূত হলে অন্য দুটি গুণ অভিভূত বা নিষ্ক্রিয় হয়। যেমন সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করে আপন শান্তবৃত্তিকে সম্পাদন করে। আর রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে নিজের দুঃখবুদ্ধিকে উৎপাদন করে। আবার তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করে নিজের মুঢ়বৃত্তিকে নিষ্পাদন করে। এটাই গুণত্রয়ের পরস্পরের অভিভববৃত্তি। গুণত্রয়ের একের সবলতা ও অন্যের দুর্বলতাজনিত পরস্পর বৈষম্য থেকেই অনন্ত বিচিত্র ভেদবিশিষ্ট জগতের উৎপত্তি হয়। আবার প্রলয়ে গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হয়। এই ত্রিগুণ প্রকৃতি আবার সুখ-দুঃখ মোহাত্মক, কিন্তু অচেতন হওয়ার কারণে সুখ-দুঃখ অনুভব করতে পারে না। তাই তা পুরুষের দ্বারা ভোগ্য। অচেতন প্রকৃতি একইসঙ্গে বিকারী তথা পরিনামী। কেননা সাংখ্য মতে, সমস্ত জগৎ-এর উৎপত্তি এই প্রকৃতি থেকেই হয়। কিন্তু পরিনামী হলেও তা অচেতন। তাই চেতন পুরুষের সান্নিধ্য না পেলে প্রকৃতির মধ্যে প্রসবধর্মিতা গুণ বিদ্যমান হয় না। যেমন পঙ্গু ও অন্ধের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পঙ্গু চলতে অক্ষম এবং অন্ধ দেখতে পায় না কিন্তু পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে আরোহন করে পথ দেখাতে পারে এবং উভয়ই অভীষ্ট দেশে গমনে সক্ষম হতে পারে। উভয়ে মিলিত হয়ে একজন দৃকশক্তি ও গতিশক্তিশীল সমর্থ্য ব্যক্তিতে পরিণত হয়।[৭] প্রকৃতি ও পুরুষের স্থলেও একইরকম হয়ে থাকে। অচেতন প্রকৃতির সাথে চেতন পুরুষ মিলিত হয়ে এই জগৎ সৃষ্টি কার্যে অংশগ্রহণে সক্ষম হয়। পুরুষ প্রকৃতির সান্নিধ্যে এলেই তবেই ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির মধ্যে বিরূপ পরিনাম শুরু হয় এবং যার পরিনাম স্বরূপ জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টি হয়।

তথ্যসূত্র:

১. অসঙ্গোহয়ং পুরুষঃ ইতি। সাংখয়সূত্র ১/৪০
২. নিত্যশুদ্ধো নিত্যবুদ্ধো নিত্যমুক্তো নিরঞ্জনঃ। সাংখয়সার উত্তরভাগ প্রথম পরিচ্ছেদ ২২
৩. ত্রিগুণ মবিবেকি বিষয়ঃ সামান্যমচেতনং প্রসবধর্ম্মি।
ব্যক্তং তথা প্রধানং তদ্বিপরীত স্তথাচ পুমান্॥ সাংখ্যকারিকা ১১
৪. সংঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ ।। সাংখ্যকারিকা ১৭
৫. জননমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্ত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিচর্যয়াচ্চৈব।। সাংখ্যকারিকা ১৮
৬. জন্মাদিব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বম্। সাংখয়সূত্র ১/১৪৯-১৫০
৭. পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যর্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥ সাংখ্যকারিকা ২১

গ্রন্থপঞ্জি:

১. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ, সংস্কৃত পুস্তকভান্ডার
২. সাংখ্যকারিকা, ২০০৭, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকভান্ডার,
৩. চক্রবর্ত্তী, ড: কমলকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, ২০১৫, বানী প্রকাশন
৪. স্বামী গৌড়পাদ,সাংখ্যকারিকা,১৯৮৫, পন্ডিত নারায়ণ মূলজী পুস্তকালয়
৫.রায়,শ্রী সুরেন্দ্রনাথ,সাংখয়দর্শন, ১৩৩২ সন, প্রথম সংস্করণ শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেস